অ্যানিমেশন শিল্প

স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ

তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবস্থা এখনও তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। ডাটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার, কলসেন্টার, আইপি কলিং ইত্যাদি প্রযুক্তি বাজারে মাইল ফলক হলেও, নানা প্রতিকূলতার কারণে এখনও সফল ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। দিন দিন তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্ববাজারে আসছে পরিবর্তন, উন্মোচিত হচ্ছে নিত্য নতুন সম্ভাবনাময় শিল্প অ্যানিমেশন শিল্পে বাংলাদেশের অযুত সম্ভাবনা। এ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন... **মেহেদী হাসান সুমন**

কল্পিত কাহিনীর শৈল্পিক প্রকাশই হচ্ছে অ্যানিমেশন। প্রযুক্তির উৎকর্ষতা অ্যানিমেশন নির্মাণকে করছে সহজ। পাশাপাশি নান্দনিকতা এবং বৈচিত্র্যও এনেছে। মূলত কার্টুন চরিত্রগুলোকে চলচ্চিত্র রূপদানের মাধ্যমেই অ্যানিমেশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। শিল্পীর হাতে আঁকা ফ্লিপ চার্টটি ছিল প্রথম অ্যানিমেশনের বাস্তবরূপ। অ্যানিমেশন মূলত দুধরনের- দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক।

মীনা জনপ্রিয় একটি কার্টুন চরিত্র। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের অধিকার এবং স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক এই অ্যানিমেটেড কার্টুন ছবিটি নির্মাণ করেছিলেন ভারতের জনপ্রিয় অ্যানিমেটর রাম মোহন। শুধু আমাদের দেশেই নয়- পার্শ্ববর্তী ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে তুমুল জনপ্রিয় এই সিরিজ। স্কুলপড়ুয়া শিশু-কিশোরদের কাছে মীনা শুধু কার্টুন চরিত্রই নয়, তাদের সহপাঠী-পরিচিত এক বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। ১২-১৪ মিনিটের এই সিরিজের পর্বগুলো ১৩ বছর ধরে জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে।

শিল্পীর হাতে আঁকা অ্যানিমেশন হতো অনেকটা সময় ও শ্রম সাপেক্ষ। ঘুড্ডি অ্যানিমো প্রতিষ্ঠানের 'গোপাল ভাঁড়' নামের ২১ মিনিট ৪২ সেকেন্ডের অ্যানিমেশনের জন্য ৫-৬ জন শিল্পী চার মাসে ২৩ হাজার পেন্সিল স্কেচ তৈরি করেছিলেন। তবে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭৬ সালে অ্যানিমেশন তৈরি হয়। ইন্দোনেশিয়ার একটি টিমের প্রশিক্ষণের সময় একটি বেলুন উড়ে যাওয়ার ওপর নির্মিত অ্যানিমেশন ক্লিপটিকেই ধরা হয় বাংলাদেশের অ্যানিমেশন শিল্পের পথিকৃৎ হিসেবে। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে অ্যানিমেশননির্ভর মাইক্রোফোনের বিজ্ঞাপনসহ আরো বেশ কিছু অ্যানিমেশন তৈরি হয়।

বাংলাদেশের দ্বিমাত্রিক অ্যানিমেশন শিল্প

২০০০ সালের শুরুতে যাত্রা করে দেশের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত অ্যানিমেশন ফার্ম গ্রিনফিল্ড টুনস। তখন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ভারতীয় অ্যানিমেটর শেখর মুখার্জি। গ্রিনফিল্ডের প্রথম অ্যানিমেশনটি ছিল 'পিঁপড়া ও ঘুঘু পাখি'। এছাড়া ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের সায়েন্স ফিকশন নিয়ে তৈরি করে 'বুগা বুগা' নামের একটি অ্যানিমেশন ফিল্ম।

এর পর প্রিন্সেস সিডনিকে নিয়ে গ্রিনফিল্ড তৈরি করে 'দ্য পিঙ্ক ডায়মন্ড অ্যানিগমা'। ৫২ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই সিরিজের ৪টি পর্ব নির্মিত হয়েছে। এই মাস থেকেই কানাডায় সিরিজটি প্রচারিত হবে। ভারতীয় অ্যানিমেশন ফার্ম রামমোহন বায়োগ্রাফির সহায়তার গ্রিনফিল্ডের নিজস্ব অ্যানিমেটরদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া

হচ্ছে। ২০০৩ সাল থেকে গ্রিনফিল্ডের অ্যানিমেশন ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন ভারতীয় অ্যানিমেটর সঞ্জিব তামাং। গ্রিনফিল্ডের পর কানাডিয়ান অ্যানিমেশন ফার্ম প্লানলার্জ ও টুনক্যানের কো-প্রোডাকশনে তৈরি হচ্ছে 'সুপারলিলি' সিরিজের ১৩ মিনিট দৈর্ঘ্যের ১৫৬টি পর্ব। এছাড়াও ২০০৪ সালে গ্রিনফিল্ড কানাডিয়ান কোম্পানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'নাইট অব দ্য পাম্পকিনস্' নামের একটি অ্যানিমেটেড ফিল্ম তৈরি করেছিল।

ফিলিপাইনের অ্যানিমেটর হানা বারবারাই জনপ্রিয় মীনা সিরিজের প্রথম দিকের পর্বগুলো নির্মাণ করেছিলেন। জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (সাবেক ইউনিসেফ) অর্থায়নে দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক সচলতা বাড়াতে এ সিরিজটি নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ভারতীয় অ্যানিমেটর রামমোহন ও ইউটিভি টুনস্ যৌথভাবে মীনার বাকি ১২টি পর্ব নির্মাণ করেন।

সম্প্রতি জনপ্রিয় এই সিরিজটির আরো পাঁচটি পর্ব তৈরির উদ্যোগ নেয় জাতিসংঘ শিশু তহবিল প্রজেক্ট। হানা বারবারা, রামমোহন বায়োগ্রাফি ও ইউটিভি টুনসের মতো প্রতিষ্ঠিত ফার্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এবারের পর্বগুলো নির্মাণের দায়িত্ব পায় গ্রিনফ্লিড টুনস্। গ্রিনফিল্ডের অ্যানিমেশন ডিরেক্টর সঞ্জিব তামাং বলেন, 'মীনার এ প্রান্তিকের প্রথম পর্ব এ মাসেই প্রচারিত হবে। বাকি চারটি পর্বও নির্মাণাধীন।' তিনি আরো বলেন, গ্রিনফিল্ডের কর্মীদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে মাত্র ৫ বছরে এটি একটি বিশ্বমানের অ্যানিমেশন ফার্মের গৌরব অর্জন করেছে।

ডিকোডে লিমিটেডের অ্যানিমেশন উইং হিসেবে গ্রিনফিল্ড টুনসের যাত্রা শুরু ২০০০ সালে। বর্তমানে এখানে ১২০ জন দক্ষ কর্মী কাজ করছেন। তাদের মধ্যে ১০০ জন চিত্রশিল্পী, বাকিরা ডিজিটাল আর্টিস্ট। গ্রিনফিল্ডের পাশাপাশি বেশ কিছু অ্যানিমেশন ফার্ম বর্তমানে কাজ করছে। এর মধ্যে একটি হলো ঘুড্ডি অ্যানিমো। ২০০০ সাল থেকে তারা অ্যানিমেশন নিয়ে কাজ করছে। তাদের প্রথম কাজ ছিল ২১ মিনিট ৪২ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের কার্টুন ছবি 'গোপাল ভাঁড়'। এটি নির্মাণ করতে তাদের প্রায় চার মাস সময় লেগেছে। এছাড়া সিটিসেল এসএমএসের বিজ্ঞাপন, প্লাস্টিক পণ্যসহ বেশ কিছু অ্যানিমেশননির্ভর বিজ্ঞাপনের কাজ করেছে ঘুড্ডি।

এসডব্লিউ মাল্টিমিডিয়ায় কাজ করছেন আমাদের টু-ডি অ্যানিমেশনের অন্যতম পথিকৃৎ এএসএম মোস্তফা জামিল আকবর। তিনি ১৯৯৬ সাল থেকেই এ পেশায় যুক্ত। তার অ্যানিমেশনে হাতেখড়ি কাঠমান্ডুর বিখ্যাত অ্যানিমেটর নির্মল সেনের কাছে। দেশের প্রথম অ্যানিমেশন স্টুডিও গ্রিনফিল্ড প্রতিষ্ঠায় তিনি

এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকার, অ্যানিমেশন ফার্ম ও বিনোয়োগকারীদের কাজের সমন্বয় আনতে হবে...

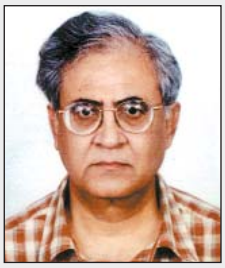

সারওয়ার আলম, *এমডি, গ্রীন ফিল্ড টুনস্*

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশের অ্যানিমেশন শিল্পের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে বলুন।

সারওয়ার আলম : বাস্তবিক অর্থে বাংলাদেশের অ্যানিমেশন শিল্প খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। আসলে অ্যানিমেশন প্রোডাকশন খুবই ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ। বাংলাদেশের স্থানীয় বাজার লক্ষ্য করে যদি আমরা এ শিল্প নিয়ে কাজ করি, তাহলে ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক হবে না। এ কারণে আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী করে প্রস্তুতি নিতে হবে।

২০০০ : বিশ্ববাজারে অ্যানিমেশন বর্তমান চিত্রটা কেমন?

সারওয়ার আলম : বিনোদন শিল্পে অ্যানিমেশন খুবই সম্ভাবনাময় মাধ্যম হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এবং এটি খুবই দ্রুত বর্ধনশীল একটি শিল্প। গত বছর শুধু আমেরিকাতে ৬০ বিলিয়ন ইউএস ডলারের অ্যানিমেশন ভিত্তিক কাজ হয়েছে। সহসাই এটা ট্রিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে। এছাড়া উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপানেও অ্যানিমেশনের একটি বড় মার্কেট আছে।

২০০০ : অ্যানিমেশনের বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করতে হলে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত?

সারওয়ার আলম : আমাদের দেশের অ্যানিমেশন ইন্ডাস্ট্রিতে বিরাট সম্ভাবনা আছে। কারণ এখানে খুবই সহজে। এখানে ভালো মানের অ্যানিমেশন করার মতো দক্ষ জনবল প্রশিক্ষিত করা সম্ভব। আর পশ্চিমা বিশ্বে এই ধরনের জনবল পাওয়া খুবই ব্যয়বহুল। মোটামুটি কাজ চালানোর মতো একটা স্টুডিও গড়ে তোলা এবং অ্যানিমেশনের প্রোডাকশন খরচ খুবই বেশি হবে। এজন্যই অ্যানিমেশন আউট সোসিং হচ্ছে। সাধারণত ক্রিয়েটিভ কনটেন্ট কাজগুলো ওখানে করা হয় এবং লোয়ার এন্ডের কাজগুলো আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে করানো হয়। ভারত, চীন, ফিলিপিন্স্ ইতিমধ্যেই এ ক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে গেছে। আসলে আইটি এনবন্ড সার্ভিসগুলোর মধ্যে মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হচ্ছে অ্যানিমেশন সার্ভিস। অ্যানিমেশনের বিশ্ববাজারে প্রবেশের একমাত্র শর্ত হচ্ছে, দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।

২০০০ : এ ক্ষেত্রে বেসিক বা সরকার কি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে?

সারওয়ার আলম : অ্যানিমেশন শিল্পকে নিয়ে সরকার আলাদাভাবে কোনো পদক্ষেপ এখন পর্যাপ্ত নেয়নি। আর বেসিসের পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন দাতা সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা করছি। আসলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এখানে কোনো প্রশিক্ষণ স্টুডিও গড়ে তোলা লাভজনক হবে না। কারণ, ভারতে অ্যানিমেশন নিয়ে তিন বছরের একটা কোর্সে প্রায় ৯-১০ লাখ রুপি খরচ হয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এতো ব্যয়বহুল একটা কোর্সে প্রশিক্ষিত অ্যানিমেটরদের তেমন কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আবার দক্ষ অ্যানিমেটরের অভাবে বিনোয়োগকারীরাও বিনোয়োগ করতে ভয় পায়। আসলে সমস্যাটা খুবই জটিল, বিনোয়োগকারীরা দেখছে জনবল নেই, আর অ্যানিমেটররাও দেখছে ইন্ডাস্ট্রি নেই। আমরাও প্রায় একই সময়ে কাজ শুরু করলেও তেমন কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে পারিনি।

২০০০ : আপনাদের কি কোনো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা আছে?

সারওয়ার আলম : না। আমাদের আলাদা কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা নেই। তবে আমাদের এখানে অ্যানিমেটরদের ইন হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। আসলে প্রাইভেট সেক্টরে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ব্যবসায়িক দিক দিয়ে লাভজনক হবে না। সে জন্য সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর উদ্যোগ নেয়া উচিত।

২০০০ : গ্রীনফিল্ডের কাজ সম্পর্কে একটু বলুন?

সারওয়ার আলম : আমাদের দেশে, এক গ্রীন ফিল্ডই আন্তর্জাতিক মানের কাজ করছে। ইতিমধ্যেই, আমরা কানাডিয়ান নির্মাতা প্লানলার্জ ও টুন ক্যানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ৫২ মিনিটের ৪টি অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরি করেছি। এছাড়া ভবিষ্যত ১৩ মিনিট দৈর্ঘ্যের ১৫৬টি পর্ব নির্মাণ করার ক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া ইউনিসেফ প্রযোজিত জনপ্রিয় অ্যানিমেশন ফিল্ম মীনার পাঁচটি পর্ব সম্পূর্ণভাবে আমাদের স্টুডিওতে নির্মিত হচ্ছে। এবারই প্রথম মীনা পুরোপুরিভাবে বাংলাদেশে নির্মিত হচ্ছে।

আধ ঘন্টার অ্যানিমেটেড প্রোগ্রাম তৈরির খরচ

দেশের নাম	খরচ (মার্কিন ডলার)
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	২,৫০,০০০ - ৪,০০,০০০
দ: কোরিয়াও তাইওয়ান	২,৫০,০০০ - ৪,০০,০০০
ফিলিপিন্স	৯০,০০০ - ১,০০,০০০
ভারত	৬০,০০০
বাংলাদেশ	৪০,০০০ - ৪৫,০০০

গ্রীনফিল্ডটুনস্ এর স্টুডিও

যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি বলেন, অ্যানিমেশন ফিল্ডে এখনও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। তবে আমাদের ছেলেরা খুব দ্রুত শিখছে। তিনি এ শিল্পে ভালো মানের কাজ করার জন্য দ্রুত একটি অ্যানিমেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি একটি স্ট্যান্ডার্ড মান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এসডব্লিউ'র কাজ সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা এখন ইউএনডিপির অর্থায়নে মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের ৮টি পর্ব নিয়ে একটি অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরি করছেন। অ্যানিমেশন শিল্পে আমাদের সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি বলেন, দেশে যতগুলো গার্মেন্টস আছে, ততোগুলো অ্যানিমেশন ফার্ম গড়ে উঠলে এই শিল্প দিয়ে গার্মেন্টসের চেয়ে দশগুণ বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

ভিজুয়্যাল সফট মূলত চলচিত্র, টেলিভিশন, ডিভিডি, গেমস্ প্রভৃতি ইন্টার অ্যাকটিভ মিডিয়া নিয়ে কাজ করে। এরা তুলনামূলক অনেক কম খরচে বিশ্বমানের কাজ করে। এদের কাজের মধ্যে আছে টু-ডি অ্যানিমেশন, থ্রি-ডি মডেলিং ও অ্যানিমেশন। আর এসব কাজের জন্য ভিজুয়্যাল সফটের আছে নিজস্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ অ্যানিমেশন স্টুডিও।

গ্লোব কিডস্ ও ডিজিটাল এন্টারটেইনমেন্ট মিডিয়ায় বেশ ভালো মানের কাজ করছে। এরা মূলত সৃজনশীল বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক দ্বিমাত্রিক অ্যানিমেশন তৈরি করছে। এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কমিক বুক ছাড়াও গ্রামীণফোন ও লুকাসের জন্য দুটি অ্যানিমেটেড বিজ্ঞাপন নির্মাণ করেছে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্র্যাকের হয়ে 'লাল হলুদ সবুজ' নামের একটি অ্যানিমেটেড ফিল্ম তৈরি করেছে।

সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাসটেরয়েডও অ্যানিমেশন-ভিত্তিক কিছু কাজ করছে। ইতিমধ্যে তারা জনপ্রিয় লেখক ইমদাদুল হক মিলনের 'ভূতের নাম রমাকান্ত কামার' গল্পের ওপর ভিত্তি করে একটি অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরি করেছে।

এগুলো ছাড়া আরও বেশ কিছু টু-ডি অ্যানিমেশন ফার্ম বর্তমানে কাজ করছে। নয়নতারা, বিসিসিপি, রেপসিড, ফিলোমেলা, গ্রাফিকস্ ইকো প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও অ্যানিমেশন ফিল্ডে বেশ ভালো মানের কাজ করছে।

বাংলাদেশের থ্রি-ডি অ্যানিমেশন শিল্প

টিভির পর্দা কাঁপিয়ে 'দেখো দেখো সবাই দেখো' ইউরোকোলার এই বিজ্ঞাপনচিত্রটি দিয়ে যাত্রা শুরু করে অ্যানিমেশন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ত্রিমাত্রিক। ২০০৩ সালের গোড়ার দিকে প্রচারিত এই বিজ্ঞাপনটি শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার মন জয় করেছিল। সাতজন স্বপ্নদ্রষ্টা তরুণ এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। এছাড়াও তারা তৈরি করেছেন ক্যাপ্টেন চিপস্, গ্লুকোজ-ডি বিস্কুট, ডায়মন্ড এগ নুডলস, দেশ ইনস্টান্ট লাচ্ছা সেমাই, ব্রিটল বিস্কুট প্রভৃতির বিজ্ঞাপন। পাশাপাশি আইয়ুব বাচ্চুর গান 'তোমার মাঝে স্বপ্নের শুরু' জিঙ্গেল হিসেবে ব্যবহার করে সানক্রেস্ট কোলার জন্য একটি বিজ্ঞাপন নির্মাণ করেছে।

টু-ডি কার্টুন ছবি বা অ্যানিমেটেড ফিল্ম দেশে বেশ কয়েক বছর ধরেই তৈরি হয়েছে। সে তুলনায় থ্রি-ডি এনিমেটেড ফিল্মের ধারণাটা একটু নতুন। সিএসএল দেশে প্রথমবারের মতো 'মন্টু মিয়ার অভিযান' নামের একটি অ্যানিমেটেড ফিল্মের সিরিজ তৈরি করে। একুশে টেলিভিশনে প্রচারিত এই সিরিজটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়।

২০০১ সালের জুনে ডেফোডিল মাল্টিমিডিয়ার যাত্রা শুরু। মূলত শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক বিভিন্ন সিডি বের করেছে ডেফোডিল। এর মধ্যে 'ছড়ায় ছড়ায় পড়া' এবং 'এসো গুনতে শিখি' উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের থ্রি-ডি অ্যানিমেশন শিল্পের সামগ্রিক অবস্থা প্রসঙ্গে ডেফোডিল মাল্টিমিডিয়ার চিফ অপারেটিং অফিসার আনোয়ার হাবিব কাজল বলেন, 'আমাদের দেশে থ্রিডি অ্যানিমেশনের চাহিদা দিন দিন বাড়ছেই। এছাড়া প্রকৃতিগতভাবেই এ দেশে সৃজনশীল লোকের সংখ্যা বেশি। সে জন্য এখানে অনেক কম খরচেই ভালোমানের কাজ করা সম্ভব।' ভবিষ্যৎ- সম্ভাবনাময় এই

ভিজ্যুয়ল ও স্পেশাল ইফেক্ট

আজকের দিনে হলিউডে সিনেমার অবিশ্বাস্য সব কল্পনাকে একদম বাস্তবসম্মত করে যে প্রযুক্তি, তার নাম স্পেশাল ইফেক্ট। ফ্রেঞ্চ পরিচালক জর্জেস মিলিসকে (১৮৬১-১৯৮১) ধরা হয় স্পেশাল ইফেক্টের পদপ্রদর্শক হিসবে। তিনি ১৯০২ সালে জুলভার্নের 'এ ট্রিপ টু মুন' নামের সায়েন্স ফিকশন ছবিতে প্রথম স্পেশাল ইফেক্ট ব্যবহার করেন। ১৯৭৭ সালে স্পেশাল ইফেক্ট জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে স্টার ওয়ারস। স্টার ওয়ারসের ব্যাপক সাফল্য পরবর্তীতে পরিচালকদের সিনেমায় স্পেশাল ইফেক্ট ব্যবহারে উৎসাহিত করে।

শিল্পে বিনোয়োগের জন্য তিনি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেশে থ্রি-ডি অ্যানিমেশন নিয়ে আরও যেসব ফার্ম কাজ করছে সেগুলো হলো, ল্যাটিচুড ২৩, এ্যারিনা ও আনন্দ মাল্টিমিডিয়া।

অ্যানিমেশনের বিশ্ব বাজার

ভারতের সফটওয়্যার সার্ভিসের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ন্যাসকম প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গেছে, গোটা বিশ্বের অ্যানিমেশন শিল্পে ২০০০ সালের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৩ হাজার ১৫০ কোটি ডলারেরও বেশি। এ উৎপাদন হচ্ছে মূলত দুটি খাতে- একটি বিনোদননির্ভর, অপরটি বিনোদনবহির্ভূত অ্যানিমেশন। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ২০০২ সালে অ্যানিমেশন শিল্প খাতে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৪ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। আশা করা যায়, চলতি বছরে এর পরিমাণ ৫ হাজার ১৭০ কোটি ডলারে পৌঁছে যাবে। রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, ভারত ২০০০ সালে ৬০ কোটি ডলারের অ্যানিমেশন তৈরি করেছে। তাদের ধারণা, এ বছর ১৫০ কোটি ডলারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে অ্যানিমেশন শিল্প।

এশিয়ার আরেক দেশ জাপানের অর্থনীতির মুখ্য প্রবৃদ্ধি অর্জনের খাত হিসেবে পরিণত হয়েছে অ্যানিমেশন শিল্প। জাপান সরকারের হিসাব অনুসারে ২০১০ সালে এই খাতে তারা ১৩৮০ কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। আর শুধু এ বছরই জাপানের তৈরি অ্যানিমেশন ফিল্মের বক্স অফিস ও ডিভিডি বিক্রি করে ৫২০ কোটি ডলার আয় করবে।

জাপানের অ্যানিমেশন ফার্মগুলোর লোয়ার এন্ডের কাজ করছে দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইনের অ্যানিমেশন ফার্মগুলো। ইতিমধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার তাদের এ শিল্প বিকাশে বিভিন্ন অ্যানিমেশন ফার্মকে বছরে এক কোটি ডলার সাহায্য দিয়েছে।

অযুত সম্ভাবনা বাংলাদেশের

বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির যতগুলো খাত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হলো অ্যানিমেশন শিল্প। এর প্রধান কারণ হলো অ্যানিমেশন নির্মাণ ব্যয়। যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় আধঘণ্টার অ্যানিমেটেড ফিল্ম তৈরিতে আড়াই থেকে ৪ লাখ ডলার খরচ হয়, সেখানে বাংলাদেশে এই ব্যয় মাত্র ৪০ হাজার ডলার। শুধু আমেরিকা বা কানাডাই নয়, ন্যাসকমের রিপোর্ট অনুসারে আমাদের দেশে কোরিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপাইন এমনকি ভারতের চেয়েও কম খরচে অ্যানিমেশন করা সম্ভব। সে কারণে আমরা বিশ্ব বাজারে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে অ্যানিমেশন সার্ভিস

অ্যানিমেশন ফিল্ম নিয়ে অস্কারে যাবার স্বপ্ন দেখি...

আরিফ আহমদ

চিফ থ্রি-ডি অ্যানিমেটর এ্যান্ড ভিজুয়্যাল এফ-এক্স ডেভেলপার, ডেফোডিল মাল্টিমিডিয়া

বাংলাদেশের থ্রি-ডি অ্যানিমেশনের প্রেক্ষাপট নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরছি-

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশে অ্যানিমেশন শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কি?

আরিফ আহমদ : প্রকৃতিগতভাবেই আমাদের দেশে সৃজনশীল লোকের সংখ্যা বেশি। তাছাড়া আমাদের দেশে শ্রমের মূল্যও কম। সে জন্য এখানে বাইরের যেকোনো দেশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে মানসম্পন্ন কাজ করানো যায়। সে কারণেই অ্যানিমেশন শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে খুবই ভালো সম্ভাবনা আছে।

২০০০ : থ্রি-ডি অ্যানিমেশনে কি কি ধরনের কাজ করা সম্ভব?

আরিফ আহমদ : মূলত থ্রি-ডি অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে ভিজ্যুয়ালাইজেশন, লে- আউট বা মার্কেটিং প্ল্যান, কার্টুন, আর্কিটেকচারাল ভিজুয়ালাইজেশন, মেডিকেল, ফরেনসিক ভিজ্যুয়ালাইজেশন, স্পেস অ্যানিমেশন, গেমের লেভেল ডিজাইন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কাজ করা যায়। এই পেশায় একটি পন্টিয়াম-৪ মানের কম্পিউটার ব্যবহার করে, ৬-১২ মাসের ট্রেনিং নিয়ে একজন অ্যানিমেটর মাসে ২০-৩০ হাজার টাকা আয় করতে পারেন।

২০০০ : টু-ডি ও থ্রি-ডি অ্যানিমেশনের মধ্যে কি ধরনের পার্থক্য আছে বলে আপনি মনে করেন?

আরিফ আহমদ : আসলে টু-ডি অ্যানিমেশনের কাজ করতে প্রচুর লোকবল দরকার। এছাড়া এটি মূলত আর্টিস্ট নির্ভর। একজনের পক্ষে কোনো টু-ডি অ্যানিমেশন করা সম্ভব নয়। কিন্তু থ্রি-ডি অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে একজনের পক্ষেই একটি প্রোগ্রাম ডেভেলপ করা সম্ভব।

২০০০ : ভবিষ্যৎ অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে কোন মাধ্যমটি জনপ্রিয়তা পাবে বলে আপনি মনে করেন?

আরিফ আহমদ : ভবিষ্যত থ্রি-ডি অ্যানিমেশনের ভবিষ্যৎ বেশি সম্ভাবনাময়। মূলত টু-ডি অ্যানিমেশন হলো বিনোদননির্ভর। কার্টুন ও কিছু কিছু বিজ্ঞাপন ছাড়া এখানে তেমন কিছু করা সম্ভব নয়। আর থ্রি-ডি অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে কার্টুন সিনেমা প্রভৃতি বিনোদন ভিত্তিক কাজের পাশাপাশি অন্যান্য আরো কাজ করা সম্ভব।

২০০০ : ডেফোডিলে আপনারা থ্রি-ডি অ্যানিমেশনের ওপর একটি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করেছেন। এটার বিশেষত্ব কি?

আরিফ আহমদ : অন্যসব প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়, যে সব শিক্ষক অ্যানিমেশনের কোর্স করান, তারা প্রফেশনাল বা পেশা হিসেবে অ্যানিমেশনকে গ্রহণ করেননি। ফলে তারা অ্যানিমেশন মার্কেট সম্পর্কে তারা অনেক অজ্ঞ। আমাদের এখানে, আমরা যারা শিক্ষক তারা নিজেরাই পেশা হিসেবে অ্যানিমেশনকে বেছে নিয়েছি। আমি মনে করি, এটাই আমাদের সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট। শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি বাস্তব নির্ভর প্রশিক্ষণ পাচ্ছে।

২০০০ : এ শিল্পের উন্নয়নে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

আরিফ আহমদ : সরকারের উচিত ভারত ও জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, এই শিল্পে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা। পাশাপাশি অ্যানিমেশন ফার্মগুলোর জন্য সহজ শর্তে ঋণ বা অনুদানের ব্যবস্থা করা। তাহলে এই শিল্প থেকে গামেন্টর্স খাতের চেয়েও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে। আর বড় বড় বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরও এই সম্ভাবনাময় শিল্পে বিনোয়োগ করা ও এই শিল্পটির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এগিয়ে আসা উচিত।

২০০০ : আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

আরিফ আহমদ : ভবিষ্যত একটি থ্রি-ডি অ্যানিমেশন স্টুডিও ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করার ইচ্ছা আছে। পাশাপাশি অ্যানিমেশন নিয়ে বই লেখার চিন্তা ভাবনাও আছে। আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হলো, অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরি করা। আর সেই ফিল্ম নিয়ে অস্কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ। পাশাপাশি বাচ্চাদের পড়াশোনা ভীতি দূর করার জন্যও সহজে শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষামূলক কিছু অ্যানিমেশন সিরিজ নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে।

রপ্তানি করতে পারবো। বাংলাদেশে মোট অ্যানিমেটরের সংখ্যা কত, এ নিয়ে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য জানা যায়নি। ন্যাসকমের তথ্য অনুসারে, ভারতে বর্তমানে প্রায় ৪ হাজার ৫০০ অ্যানিমেটর আছে। কিন্তু ২০০৭ সালে অ্যানিমেশনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য তাদের প্রায় ১৮ থেকে ২০ হাজার অ্যানিমেটর লাগবে। কিন্তু এতো অল্প সময়ে এই বিরাট চাহিদা পূরণের সামর্থ্য তাদের নেই। তাই ভারত বাধ্য হয়েই আউটসোর্সিংয়ের জন্য অ্যানিমেটর খুঁজবে। আর এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হয়ে উঠতে পারে তাদের প্রথম পছন্দ। কারণ, বাংলাদেশ থেকে তারা আরও কম খরচে ভালোমানের কাজ করিয়ে নিতে পারবে। বিশেষ করে বিভিন্ন অ্যানিমেটেড ফিল্মের লোয়ার এন্ডের কাজ করার প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি হবে দেশীয় ফার্মগুলোর সামনে।

জনপ্রিয় এনিমেশন 'মীনা' এর কাজ করছেন একজন শিল্পী

সারা বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এ কথা খুব সহজেই বলা যায়, অ্যানিমেশন শিল্প হচ্ছে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে দ্রুত প্রসারণশীল শিল্প। সাম্প্রতিক কালের একটি জরিপে দেখা গেছে, ২০০০ সালের সারা বিশ্বের অ্যানিমেশন উৎপাদন ২০০৫ সালে এসে দ্বিগুণ হয়েছে। ভারতের ২০০১ সালের অ্যানিমেশন বাজার ২০০৫ সালে এসে প্রায় তিনগুণ হয়ে গেছে। জাপান ২০১০ সালের মধ্যে প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রধান খাত হিসাবে অ্যানিমেশন শিল্পকেই চিহ্নিত করেছে। ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, চীন, তাইওয়ানসহ এশিয়ার বহু দেশ এই শিল্পে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। অথচ শুধু সচেতনতা ও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে আমরা এই খাত থেকে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারছি না।

বিপুল সম্ভাবনাময় এই শিল্পকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে এ খাতে গার্মেন্টস শিল্পের চেয়েও দশগুণ বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। আমাদের দেশে যেহেতু শ্রমের মূল্য খুবই কম এবং প্রকৃতিগতভাবেই এ দেশে সৃজনশীল লোকজনের সংখ্যা বেশি, সে কারণে এখানে অ্যানিমেশন তৈরির ব্যয় উন্নত বিশ্বের তুলনায় ১৫ গুণ কম। ফলে বহু বিদেশী কোম্পানি আমাদের দেশ থেকে কাজ করিয়ে নিতে আগ্রহী। ভারত এ ধরনের প্রচুর কাজ করলেও এখন তারা দক্ষ জনবলের অভাবে ভুগছে। অ্যানিমেশন শিল্প প্রসারের সবচেয়ে বড় বাধা হলো দক্ষ জনশক্তির অভাব।

এ ধরনের দক্ষ জনশক্তি গড়তে যে মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দরকার, তা স্থাপন ও পরিচালনা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ভারতের ইনস্টিটিউটগুলোতে অ্যানিমেশনের কোনো কোর্স করতে বছরে ৯-১০ লাখ রুপি খরচ হয়। বাংলাদেশেও খরচটা এমনই হবে। সে কারণে এতো ব্যয়বহুল কোর্সে শিক্ষার্থী খুঁজে পাওয়া হবে কষ্টকর। তাই সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর উচিত স্বল্পমূল্যে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। ভারত সরকার দক্ষ অ্যানিমেটর গড়ে তুলতে ৬০ লাখ ডলার সহায়তা দিয়েছে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া সরকারও এ খাতের বিকাশে ব্যাপক সাহায্য-সহায়তা দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রটিকে গুরুত্ব দিয়ে অতি সত্বর কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত।

সিনেমায় থ্রি-ডি অ্যানিমেশন

বড় পর্দায় প্রথম থ্রি-ডি অ্যানিমেশন ব্যবহৃত হয় ওয়ার্ল্ড ডিজনির Tron সিনেমায় ১৯৮২ সালে। তবে প্রথম যে থ্রি-ডি ইফেক্টস্ প্রচলিত পদ্ধতিতে বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে তা হলো ১৯৯৩ সালে মুক্তি পাওয়া জ্যুরাসিক পার্ক ছবিটি। ১৯৯৫ সালে সম্পূর্ণ কম্পিউটারে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ট্রয় স্টোরি' থ্রি-ডি অ্যানিমেশন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করলো। সাম্প্রতিক কালের শ্রেক, বাগস্ লাইফ এক্সম্যান, আইস এজ, লর্ড অব দি রিংস, ম্যাট্রিক্স্, ইন্ডিপেন্ডেন্টস ডে ও ফাইন্ডিং নিমো হলো ব্যবসা সফল থ্রি-ডি অ্যানিমেটেড সিনেমার উদাহরণ।

আশার কথা হচ্ছে, আমাদের দেশের কিছু প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে উন্নত বিশ্ব থেকে কাজ এনে সফলভাবে করছে। এসব কাজের মধ্যে আছে দ্বিমাত্রিক কার্টুন অ্যানিমেশন, ত্রিমাত্রিক আর্কিটেকচারাল ভিজ্যুয়ালাইজেশন, মেডিকেল ভিজ্যুয়ালাইজেশন, প্রোডাক্ট মডেলিং, লে-আউট ডিভাইন ও গেমের লেভেল ডিজাইন ইত্যাদি। এসব কাজের বেশির ভাগই হচ্ছে উন্নত বিশ্বের কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কো-প্রোডাকশনের ভিত্তিতে। যে কারণে প্রোডাকশনের মোট উৎপাদন ব্যয় কম হচ্ছে।

সাম্প্রতিক এক তথ্যে জানা গেছে, আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১২ লাখ ৯ হাজার। এখান থেকে ১৫-২০ হাজার লোকও যদি অ্যানিমেশন শিল্পে দক্ষ করে তোলা যায়, তাহলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক চেহারাই পাল্টে যাবে। এসএসসি বা এইচএসসি লেভেলের বেকারদের ৬-১২ মাস ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা যেতে পারে। একজন বেকার যুবক বা যুবতী অ্যানিমেশন শিখে নিজেই একটি কম্পিউটার নিয়ে আয়ের পথ তৈরি করতে পারে।

শেষের কথা

বাংলাদেশের অ্যানিমেশন ফার্ম বা অ্যানিমেটরদের নিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ জরিপ বা সমীক্ষা এখনো চালানো হয়নি। এ নিয়ে তেমন কোনো গ্রহণযোগ্য তথ্যও পাওয়া দুষ্কর। এ খাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জনের জন্য সরকারের উচিত এ শিল্পের ওপর ভিত্তি করে একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপ পরিচালনা করা এবং জরিপের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আগামী দিনের উপযোগী বাস্তবমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার আশু বাস্তবায়ন।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা বিশ্বেই দক্ষ অ্যানিমেটরের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এমনকি ভারতেই ২০০৭ সালে দরকার হবে ১৮ থেকে ২০ হাজার অ্যানিমেটর। কিন্তু তাদের আছে মাত্র ৪ হাজার ৪০০ থেকে ৪ হাজার ৫০০ অ্যানিমেটর। সে কারণেই দক্ষ অ্যানিমেটর তৈরির জন্য একটি ভালোমানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা জরুরি। যেহেতু এ রকম প্রতিষ্ঠান স্থাপন ব্যয়বহুল ও অলাভজনক, তাই বেসরকারি সংস্থা এখানে বিনিয়োগ করবে না। সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর এগিয়ে আসা উচিত একটি আন্তর্জাতিক মানের অ্যানিমেশন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনে।

জনপ্রিয় অ্যানিমেশন মুভি 'শ্রেক'

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের একটি অংশ হিসেবেই অ্যানিমেশনকে দেখা হচ্ছে। সে কারণেই এ নিয়ে সরকারের আলাদা কোনো চিন্তাভাবনা নেই। কিন্তু সম্ভাবনাময় এই শিল্প বিকাশে আলাদাভাবে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের মতো অ্যানিমেশন শিল্পের জন্য আলাদা একটি তহবিল গড়ে তুলতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি তহবিল থাকলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ঐ তহবিলের অর্থ পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অ্যানিমেশন শিল্পের জন্য এই তহবিলে বিশেষ অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। পাশাপাশি অর্থ প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুততর করা বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে কম মূল্যে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কাজ করা সম্ভব- বিশ্ববাজারে এই প্রচারণাটা চালানো খুব জরুরি। পাশাপাশি আমাদের অ্যানিমেশনের মান নিয়ন্ত্রণ ও ফার্মগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্যও একটি সংস্থা স্থাপন করতে হবে। যাতে করে বিদেশে আমাদের অ্যানিমেশন ফার্মগুলোর প্রতি আস্থা তৈরি হয়। এছাড়া আইসিটি ইনকিউবেটরের জন্য কোনো স্থাপনা সহজ শর্তে অ্যানিমেশন ফার্মগুলোর মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বোপরি, আইসিটি মন্ত্রণালয়ের উচিত হবে বিশ্ববাজারে দেশের অ্যানিমেশন শিল্প নিয়ে মেলা, সেমিনারসহ ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

যেহেতু আলাদাভাবে একটি অ্যানিমেশন একাডেমি গড়ে তোলা খুবই ব্যয়বহুল, সে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধীনে অ্যানিমেশন বিভাগ নামে আলাদা একটি বিভাগ চালু করা যেতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সম্পর্কিত কোর্স চালুর ব্যাপারে উৎসাহিত করা দরকার। এছাড়া সীমিত পরিসরে যেসব প্রতিষ্ঠান থ্রি-ডি অ্যানিমেশন কোর্স চালু করেছে, সেগুলোর পাঠক্রম মান ও শিক্ষকমন্ডলীর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। যেহেতু সফটওয়্যার শিল্পে ভারত আমাদের চেয়ে বেশ সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছে গেছে, সেখানে আমরা প্রতিযোগিতা করে টিকতে পারবো না। আইটি ইনভল্ব সার্ভিসগুলোর মধ্যে অ্যানিমেশন শিল্পে দু-একটি দেশ ছাড়া বাকি সবার অবস্থা নড়বড়ে। আর যেহেতু আমাদের শ্রমের মূল্য ভারতের চেয়েও কম, সেহেতু এ ক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে আমরা বেশি সুবিধা পাবো। এ বিষয়ে সরকারের জরুরি ভিত্তিতে একটি সমীক্ষা চালানো দরকার। যাতে করে এ শিল্পের ক্ষেত্রগুলো আমরা সহজে খুঁজে পাই। তাছাড়া আমেরিকা, কানাডা ও জাপানের বড় কাজগুলো আউটসোর্সিং হয়ে ফিলিপাইন, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও ভারতে চলে যায়। এই কাজগুলো যাতে আমরাও পেতে পারি, সে ক্ষেত্রে সরকার বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে।

অ্যানিমেশন শিল্পে মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিষ্ঠিত প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। সে জন্য আমাদের অ্যানিমেশন ফার্মগুলোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নত করতে হবে। শুধু অ্যানিমেটর হলেই চলবে না, ফার্মের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। যার জন্য দরকার বড় ধরনের বিনিয়োগ। দেশের ব্যাংকগুলোতে প্রচুর অর্থ অলস পড়ে আছে। এসব অর্থের মালিকদের সামনে অ্যানিমেশন শিল্পের সম্ভাবনা তুলে ধরতে হবে। তবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অ্যানিমেটর তৈরি না হলে বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে আসবে না। এটা স্পষ্ট যে, এই শিল্পে আমাদের খুবই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। আমাদের দেশীয় ফার্ম গ্রিনফিল্ড ফিলিপাইন ও ভারতের ফার্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে মীনার কাজ পেয়েছে। গ্রিনফিল্ড পারলে অন্যরাও পারবে। আর সে জন্য দরকার বাস্তবমুখী পরিকল্পনার দ্রুত বাস্তবায়ন। প্রাথমিক অবস্থায় একটি অ্যানিমেশন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, এই শিল্পে ব্যাপক ও সহজ শর্তে ব্যাংকঋণ প্রদান ও বিশ্ববাজারে আমাদের সামর্থ্যের যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করবে একই রৌদ্রোজ্জ্বল সোনালি ভবিষ্যতের। যার স্বপ্ন দেখছে আমাদের অ্যানিমেটররা, আর স্বপ্ন দেখাচ্ছে বাংলাদেশকে।

আরিফ আহমেদের করা একটি থ্রিডি অ্যানিমেশন

টু-ডি ও থ্রি-ডি অ্যানিমেশন

টু-ডিকে বাংলায় বলা যাবে দ্বিমাত্রিক। আর থ্রি-ডি হলো ত্রিমাত্রিক। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এগুলো হচ্ছে একেকটি মাত্রা। আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি তার সবকিছুই হচ্ছে তিন মাত্রাবিশিষ্ট। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুরই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা আছে। আর দুই মাত্রা হচ্ছে কোনো তল। যেমন কাগজের তল, এর কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে। একমাত্রা হলো রেখা। আর বিন্দুর কোনো মাত্রা নেই। অর্থাৎ বিন্দু শূন্য মাত্রিক।

মূলত কমিকস্ বইতে দ্বিমাত্রিক অ্যানিমেশনের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন কার্টুন ছবিতে টু-ডি অ্যানিমেশন ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে কার্টুন ছবি ছাড়াও বিভিন্ন অ্যানিমেটেড ফিল্ম ও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে টু-ডি অ্যানিমেশন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

থ্রিডি অ্যানিমেশনের সূত্রপাত মূলত সিনেমায়। বিদেশী অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র ছাড়াও টিভি বিজ্ঞাপন, কম্পিউটার গেম, মাল্টিমিডিয়া, ওয়েভ ইলাসট্রেশন ও ফাইন আর্টস, ফরেনসিকস ডিজাইন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন লে-আউটের ক্ষেত্রে থ্রি-ডি অ্যানিমেশনের ব্যবহার ক্রমশই বাড়ছে।